দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... JUN. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষার ফল

দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গত বৃহস্পতিবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৫৩, কুমিল্লা বোর্ডের ৫৬·৩৮, রাজশাহী বোর্ডের ৪৯·৪৩, যশোর বোর্ডের ৫৮·৭৫ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডের ৫৯·৮৫। ৫ বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৫·৪৮। গড় পাসের এই হার সন্তোষজনক, না সন্তোষজনক নয়; তা নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে ব্যক্তিভেদে। কেউ একে সন্তোষজনক বলে মনে করতে পারেন। কোনো কোনো বছর গড় পাসের হার এর চেয়েও কম হতে দেখা গিয়েছে। সেই দিক থেকে এ হার কারো কারো চোখে উৎসাহজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা তো এই যে, প্রায় ৪৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অনেকের ধারণা, আলোচ্য পরীক্ষায় যেভাবে ফ্রি স্টাইলে নকল হয়েছিল তাতে পাসের হার আরও বেশী হওয়ার কথা ছিল, যা হয়নি। ফ্রি স্টাইলে নকল হলেই যে সবাই পাস করবে, বা পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বাড়বে এটা মনে করার কারণ নেই। আমাদের শিক্ষার মান এরূপ নিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রীর খোঁজ পাওয়া যাবে, যারা বই খুলে দিলেও উত্তর সঠিকভাবে লেখার 'যোগ্যতা' রাখে না। তাদের ক্ষেত্রে নকলের সুযোগ পাওয়া আর না পাওয়া একই কথা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে এবং সেই ব্যতিক্রম ফলাফলের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল ফারাক তৈরী করে দিতে পারে। এমনও দেখা গেছে, যার মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার মোটেই কোনো সম্ভাবনা ছিল না; সামান্য বা বেশী 'সুযোগ-সুবিধা' পেয়ে সে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যার মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছিল সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রত্যাশিত, সে তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনা এবারের ফলাফলের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষা মানেই যেহেতু প্রতিযোগিতা এবং অপেক্ষাকৃত ভালো ও অপেক্ষাকৃত মন্দের যাচাই-বাছাই সুতরাং নকল এ ক্ষেত্রে তার অপপ্রভাব ফেলবেই, এটা জানা কথা। এ কারণেই নকল ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষাই কাম্য, যাতে ঠিক মতো মেধা যাচাই হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হচ্ছে, নকলমুক্ত, সুষ্ঠু, স্বাভাবিক পরীক্ষা আমাদের দেশে কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতি পরীক্ষার আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নকল ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়, নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা জানানো হয়। কিন্তু বাস্তবে ঘোষিত অঙ্গীকার ও ব্যবস্থা কার্যকর হতে দেখা যায় না। আলোচ্য পরীক্ষায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বস্তুতঃপক্ষে নকল ও দুর্নীতি রোধের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভালো করে পড়াশুনা করার প্রবণতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমনিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনার মান শোচনীয়ভাবে নেমে গেছে। সেই সঙ্গে নকলের সুযোগ ও প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার ফলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। নকল করে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় কিংবা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা যায়, তবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশুনায় মনোনিবেশ করবে কিভাবে এবং কেনই বা করবে? এই নেতিবাচক মনোভাব শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে। মোট কথা, নকল এমন এক দুষ্টক্ষত যা মেধা যাচাই ব্যাহত করছে, শিক্ষার মান ধ্বংস করছে এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলছে। সুতরাং যে কোনো মূল্যে পরীক্ষায় নকল এবং অন্যান্য দুর্নীতির মূলোৎপাঠন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

আলোচ্য পরীক্ষার ফলাফলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। দেশের বেশ কিছু ভালো বলে চিহ্নিত স্কুলে ফলাফল যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা হয়নি। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো কোনো স্কুলের ফলাফল ভালো হয়েছে। কোনো কোনো স্কুলের ফলাফল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এছাড়া দেখা গেছে, ক্যাডেট কলেজ এবং শহরের স্কুলগুলোর ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো হয়েছে। ফলাফল ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। অভিযোগ আছে, কোনো কোনো স্কুলে ব্যবহারিক পরীক্ষা ঠিক মতো নেয়া হয় না। ঢালাওভাবে নম্বর দিয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো স্কুলে নাকি অর্থের বিনিময়েও নম্বর দেয়া হয়। বস্তুতঃ এ ধরনের দুর্নীতি পরীক্ষার ফলাফলে অনিবার্য প্রভাব রেখে থাকে। খাতা দেখা, ফলাফল সমন্বয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এবারের পরীক্ষায় এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি কতটা হয়েছে, এ মুহূর্তে তা জানা যায়নি। নকল, দুর্নীতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও এখন পর্যন্ত তা সোনার হরিণই হয়ে আছে। প্রকাশিত ফলাফল নিয়ে আমরা আপাততঃ আর কোনো মন্তব্য করতে চাইনে যারা কৃতকার্য হয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানাই। যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। আশা করি, তারা ভবিষ্যতে কৃতকার্য হওয়ার জন্য সচেষ্ট হবে।